OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 640 - 650
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ঊনবিংশ শতাব্দীর উত্তরবঙ্গে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ : মিশনারি চিকিৎসা এবং তৎকালীন সামাজিকক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা (১৮৩০–১৯২০)

পৃথা মন্ডল
গবেষক, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা ইনস্টিটিউট
রাজা নরেন্দ্রলাল খান উইমেনস কলেজ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: prithamondal112@gmail.com
0009-0001-3528-6964

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Rajbanshi, Witchcraft, Tertian fever, Quinine, Joka Jogini.

Abstract
In the second half of the nineteenth century, specifically between 1830 and 1920, the contributions of Christian missionaries to treating 'marsh fever'—subsequently identified as malaria—remained very important to the broader medical landscape of North Bengal. During this period, the healthcare environment across North Bengal, particularly in regions like Darjeeling, Jalpaiguri, and their surrounding territories, was notoriously deplorable. Prior to the medical interventions introduced by the British administration and various missionary groups, the local female population relied heavily on occult practitioners, exorcists, hakims, and traditional healers, deeply embedding their healthcare choices in superstitious customs. Due to a total absence of state initiatives and systemic government neglect, impoverished tea garden labourers and indigenous women were forced to depend on ancestral indigenous medicine and herbal remedies for survival. Consequently, numerous pregnant women lost their lives due to malpractice and flawed treatments. This high mortality rate was exacerbated by a widespread ignorance regarding malaria, a severe lack of literacy, and a profound absence of public health campaigns, which left the local populace entirely unaware of the true nature of the epidemic. As a hill station, Darjeeling represented a distinct archetype of colonial urbanization. In colonial India, the development of hill stations was fundamentally shaped by racial segregation, whereas the historical focus on subaltern women was primarily confined to their roles as tea plantation labourers. This colonial urban planning mirrored a stark spatial divide between indigenous and European residential quarters, gradually solidifying into segregated 'white' and 'black' towns. Darjeeling occupied an exclusive position; it served as a vital administrative, political, and commercial hub catered specifically to the elite of the British Raj. Despite growing anxieties among the colonial authorities regarding the town's overpopulation, Darjeeling enjoyed exceptional municipal amenities compared to the rest of Bengal—a privilege manifested in exclusive institutions

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

like the Eden and Louis Sanitariums, the Governor's Residence, and the Planters' Club.

Consequently, the indigenous settlements situated within the core of Darjeeling were systematically displaced to peripheral zones. Subaltern slum areas were officially designated as hazardous vectors of disease. This 'Edenic sanctuary' was explicitly engineered to serve the colonial economy rather than the migrant populations or the native hill communities. Driven by an exponential population growth not just within the urban center but also across remote frontiers, indigenous groups like the Lepchas were steadily evicted from their ancestral lands. Thus, the systemic marginalization of local inhabitants—including indigenous and migrant women—compelled them to depend entirely on traditional medicine for any health crises.

However, this analysis does not imply that native medicine was inherently ineffective. Rather, the critical issue lay in the fact that local traditional healers, such as the vaidyas, hakims, and occult practitioners, lacked the empirical scientific understanding required to standardize and administer the extracts derived from medicinal leaves and roots. For instance, the only definitive cure for malaria was quinine, an alkaloid scientifically extracted and processed from the pulverized bark of the Cinchona tree. Historically, evidence reveals that due to the flawed and unscientific practices of these healers, pregnant women were frequently administered dangerously high, unregulated doses of quinine. This caused severe uterine contractions, resulting in widespread induced abortions and maternal deaths among expectant mothers. Under these precarious conditions, women frequently relied not only on hakims and vaidyas but also on traditional midwives (dhais or dais). Furthermore, local women frequently resisted seeking treatment from trained male physicians. Driven by the gendered conservatism of the era and the rigid enforcement of social norms, women were often socially constrained from accessing professional medical care, leaving their healthcare needs neglected by modern empirical science.

Summarily, this study analyses the specific therapeutic strategies and interventions adopted by various Christian missionaries to combat malaria. By examining these historical dynamics, this study illuminates the pivotal role played by missionary medicine in treating the female population of North Bengal, while critically evaluating the socio-economic and political mechanisms through which these medical interventions were deployed.

Discussion

উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যবর্তী সময় উত্তরবঙ্গের ম্যালেরিয়া অর্থাৎ 'মার্শ ফিভার' সমগ্র পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে যে 'মহামারি' থাবার ন্যায় বিভিন্ন অঞ্চলে তার প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়।

"ওরে ও কালা মশা, তুই কেনে কামড়াইলি গা,
হাড়ের কাপুনি দিয়া জ্বর যে আইল গা।
গাও ধকধক করে মোর, বুক ফাটি যায়,
ওঝা আসিয়া মোর কপালে হাত বুলায়।
দাই বুড়ি কান্দে বসিয়া ঘরের কোণাতে,
কুইনিন তিতা বড়, পারো না মুই গিলিতে।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এক্ষেত্রে উত্তর ভারতের ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রান্ত বিষয় জানবার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকেও কিন্তু এই ম্যালেরিয়ার উপদ্রব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকোপ সম্পর্কে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনার অন্যতম দিক নির্দেশক হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন দিকগুলো অনুধাবিত হলেও উত্তরবঙ্গের ম্যালেরিয়া রোগ তথা সেখানকার যে সমস্ত নারীরা চা চাষাবাদের সাথে জড়িত ছিল এবং বিভিন্ন কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল, সেই সমস্ত নারীর ইতিহাস কোথাও গিয়ে উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে, যা আমি আমার সমগ্র লেখনী তথা গবেষণার মধ্য দিয়ে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এবং আরও একটি বিষয় প্রত্যক্ষ করা হয়— ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ তথা ম্যালেরিয়া রোগ-সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী দিক থাকলেও কেনই বা আমি উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত মহিলারা, বিশেষত বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত মহিলারা ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, তাঁদের ইতিহাসটিকে তুলে ধরলাম, সেই বিষয়টিকেও আমি আমার সমগ্র বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে তুলে ধরলাম। প্রাচীনকাল থেকে ম্যালেরিয়া রোগ সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ঘটে চলেছে এবং সেইসূত্রে এই ব্যাধিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আলোচনাকেন্দ্রিক বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচিত হয়েছে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক আলোচনায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা রোগ ও রোগব্যবস্থার বিষয় উঠে এসেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ম্যালেরিয়ার মতো সংক্রামক রোগও ঐতিহাসিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবং গত প্রায় দুই দশক ধরে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচ্য বিষয়বস্তু বিস্তারিত পর্যালোচনা দিকটি তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বাংলার ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রাচ্য তথা আমাদের ভারতবর্ষ, বিশেষত উত্তরবঙ্গের যে আবহাওয়াগত পরিস্থিতি ছিল এবং সেই আবহাওয়া ও পাশ্চাত্যের আবহাওয়া ও তার পারিপার্শ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের মধ্যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে অনুধাবন তথা অনুসন্ধান করলে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, সেইক্ষেত্রে প্রাচ্যের ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসা যা পাশ্চাত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, প্রাচ্যের জলবায়ুতে মানুষের রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর হিসেবে পরিগণিত হয়। এক্ষেত্রে দার্জিলিং তথা উত্তরবঙ্গীয় অঞ্চলের জলবায়ু এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু হওয়ার কারণে বিশেষত ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ইউরোপীয়রাও মনে করত যে এইখানকার জলবায়ু তথা উত্তরবঙ্গের ক্রান্তীয় জলবায়ু ইউরোপীয় জলবায়ুর তুলনায় অধিক উপযোগী। এক্ষেত্রে Indian Medical Service অর্থাৎ ভারতীয় চিকিৎসা পরিষেবা। এর কর্মকর্তা এস. পি. জেমস জানান - কলকাতায় শূন্য থেকে ডুয়ার্সে সর্বোচ্চ ৭২ শতাংশ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া প্রকোপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। ডুয়ার্সে ম্যালেরিয়া সম্পর্কিত প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদনে এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হলে উত্তরবঙ্গের উপনিবেশিক শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত বিষয়টিকে উন্মোচিত করতে হলে সেক্ষেত্রে সেইসব মশার বিভিন্ন প্রজাতির দিকটিকেও তুলে ধরছি যা সমগ্র এসপি জেমসের লেখনীর মধ্যে দিয়ে। এক্ষেত্রে বলা হয়, অ্যানোফিলিস মশার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে। এই সফরের সময় কমিশন ডুয়ার্সে অ্যানোফিলিসের দুটি নতুন প্রজাতির সন্ধান পায়। তার দরুন ম্যালেরিয়াকে নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র স্যানিটারি ব্যবস্থা বা জলবায়ুগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা যথাযথ ভাবে ঠিক নয়, এক্ষেত্রে আরো বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাসবিদেরা ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তারের সামাজিক ও সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পশ্চিমবঙ্গ রেলপথ নির্মাণের সময় রোগের প্রাদুর্ভাবের কথা জানা গিয়েছিল। ১৮৯৬ সাল থেকে গৌহাটি থেকে লামডিং পর্যন্ত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে নির্মাণের সময় নওগাঁয়ে জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পর্যবেক্ষণে বহুবার দেখা গেছে যে বাঁধ নির্মাণের পরবর্তী ক্ষেত্রে বাঁধের উভয় পাশে স্থানীয়ভাবে ম্যালেরিয়ার বিস্তার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে স্থানীয় জায়গায় মৃত্যুহার বৃদ্ধি, জ্বরের রোগীর অনুপাত বৃদ্ধি, জ্বরজনিত মৃত্যুর বৃদ্ধি এবং স্প্লিন ইনডেক্স বা প্লীহার সূচক বৃদ্ধিও লক্ষ্য করা যায়। রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়া সংক্রমণে মশার ভূমিকা আবিষ্কারের পূর্বে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের প্রধান দুটি পদ্ধতি নিয়ে বলেছেন — জলাভূমির জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে ফেলা বা নিষ্কাশন করা এবং দ্বিতীয়ত, সিনকোনা গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত কুইনাইন ব্যবহার করা। ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতের প্রধান শহরগুলিতে নিষ্কাশনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। সরকারি চিকিৎসা বিভাগগুলির মাধ্যমে কুইনাইন বিতরণ করা হত এবং সেখান থেকে তা সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছত।[১]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলিতে ম্যালেরিয়া গবেষণার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপনিবেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পিছনে থাকা কারনগুলো অনুসন্ধান করা হয়েছে। এখানে ঔপনিবেশিক ম্যালেরিয়া গবেষণায় 'স্থানীয়তা' বা locality-এর দ্বৈত ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার স্থান রোগের কারণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেমন একটি প্রধান উপাদান হিসেবে গুরুত্ব লাভ করেছিল, তেমনই ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রেও তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু গবেষণা এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য নির্দিষ্ট স্থানগুলির ক্ষেত্রে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেই একই গুরুত্ব সেইসব অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদি ম্যালেরিয়া-বিরোধী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি। মিয়াজমা-ভিত্তিক জ্বরের তত্ত্বকে অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিকিৎসাবিদ্যা, বিশেষত ম্যালেরিয়া গবেষণার কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করা এবং ম্যালেরিয়া-বিরোধী নীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় ব্রিটিশ-ভারতীয় চিকিৎসাবিষয়ক আলোচনায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ভারতীয়দের জাতিগত ও সভ্যতাগত অধঃপতনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল এবং তাঁদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'সংস্কারমূলক' অগ্রগতির বাইরে বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলি ছিল অর্থনৈতিক কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ১৯০০ সালে দার্জিলিং, তরাই এবং ডুয়ার্স মিলিয়ে উৎপাদিত চা ভারতের বার্ষিক চা-রপ্তানির এক-চতুর্থাংশেরও বেশি ছিল এবং এই চা-বাগানগুলিতে দুই লক্ষেরও বেশি শ্রমিক নিযুক্ত ছিলেন। এই সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকরা, যারা বিভিন্ন কাজকর্মে নিযুক্ত থাকত, তারা ম্যালেরিয়াজনিত জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বহুক্ষেত্রে যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ার দরুন মৃত্যু ঘটতো।[২]

এক্ষেত্রে নারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে মিশনারীদের এবং ধাত্রীবিদ্যার দিকটিও অগ্রগন্য। এক্ষেত্রে Akansha jha তাঁর Female Medical Missionaries and Gendered Authority in Colonial North India - ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা ইতিহাসের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল নারী স্বাস্থ্যরক্ষা, বিশেষত মহামারী ম্যালেরিয়া নিরাময়ের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রাতিষ্ঠানিক অবদান অনস্বীকার্য। তৎকালীন ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামোয় উত্তরবঙ্গের বহু মধ্যবিত্ত নারীরা কঠোর পর্দা প্রথার শৃঙ্খলে পুরুষতান্ত্রিক মনস্তত্ত্বর দরুন নিজেদের আবদ্ধ রাখতে বাধ্য ছিলেন; ফলে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক রক্ষণশীলতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকোচের কারণে পুরুষ চিকিৎসকদের দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসাব্যবস্থার গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এই প্রাতিষ্ঠানিক অচলাবস্থা দূরীকরণে তৎকালীন নারী মিশনারীরা এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর ভেঙে পর্দানশীন নারীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় চিকিৎসা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করেন। মিশনারীরা প্রথাগত ভেষজ বা কবিরাজি চিকিৎসার পরিবর্তে তৎকালীন নব্য-আবিষ্কৃত পাশ্চাত্য চিকিৎসাপদ্ধতির (Western Medicine) অনুপ্রবেশ ঘটান এবং আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যবিধি ও কুইনাইনের মতো আধুনিক ভেষজের প্রয়োগ করেন, যা উত্তরবঙ্গের নারী চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল রূপান্তর ঘটানোর পাশাপাশি এই অঞ্চলের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার আধুনিকীকরণে এক যুগান্তকারী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল।[৩]

সার্বিক দিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ম্যালেরিয়া তথা 'মার্শ ফিভার'-এর চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিসরে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উন্মোচিত হয়, তা হল — উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণীভুক্ত বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে কতখানি সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছিল। সমকালীন সমাজ-ইতিহাসের আলোচনায় এই প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্তির প্রাতিষ্ঠানিক দিকটিকে সাময়িকভাবে সরিয়ে রেখে যদি কেবল এই প্রান্তিক মানুষদের মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়, তবে স্পষ্ট হয় যে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যাকে তারা নিজেদের চিন্তনে এবং মননে কতখানি স্থান দিতে পেরেছিল এবং তাদের মননে এর গ্রহণযোগ্যতা কতখানি গভীর ছিল— সেই মৌলিক দিকটিই এখানে প্রধান অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

Mrs. Sumita Roy Choudhury তিনি তাঁর লেখনীর মধ্যে দিয়ে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ড. অনন্ত দাস তাঁর ২০২২ সালের জুলাই মাসে সম্পন্ন করা Change and Community in the Folk Medicinal Practices among the Asurs of Jalpaiguri District, 1865–1947 শীর্ষক গবেষণাযর একটি ঘটনা যথাযথ ভাবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ্লেষণ করেন, এক্ষেত্রে বিভিন্ন জনজাতি তাঁদের প্রাত্যহিক বা সাধারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার বিষয়টি আলোকপাত করেন। ছোটনাগপুরের বহু উপজাতি এবং মেচ, টোটো, রাভা, অসুর, রাজবংশী, গারো, সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাঁও, নেপালি, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও লোকায়ত চিন্তাধারাকেই প্রাত্যহিক জীবনে অধিকতর প্রাসঙ্গিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছে। ফলে, বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি বা আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মীকরণের পরিবর্তে তারা তাদের প্রচলিত বিশ্বাসের ওপরই আস্থা বজায় রেখেছে।

চা-বাগানের অধিকাংশ অভিবাসী উপজাতি বিশ্বাস করত যে রোগ এবং মৃত্যু অতিপ্রাকৃত শক্তির কারণে ঘটে। তাই তারা ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাপদ্ধতি ও প্রথার ওপর নির্ভর করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বুচানন হ্যামিল্টন উল্লেখ করেন যে সাপের কামড় 'বিষহরি'র নাম নিয়ে এবং গুটিবসন্ত 'শীতলা'র মাধ্যমে নিরাময়ের চেষ্টা করা হত।

এছাড়াও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যভাবনা ও নিরাময় সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা প্রথাগত চিকিৎসা কাঠামোর বিকল্প হিসেবে স্থানীয়ভাবে লভ্য বিবিধ ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন। কাশি ও সর্দির জন্য তুলসীপাতা বা তুলসী গাছ এবং মধু ব্যবহৃত হত।[৪] স্মল পক্স বা গুটি বসন্তের প্রাদুর্ভাবের ন্যায় এক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর সামাজিক কুসংস্কার ও লোকায়ত বিশ্বাসের উপস্থিতিই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

গুটি বসন্তকে যেমন অতিলৌকিক বা দৈব কোপ হিসেবে গণ্য করা হত, ঠিক তেমনি ম্যালেরিয়ার তীব্র কাঁপুনি কিংবা পালাজ্বরকে (Intermittent Fever) তৎকালীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কোনো সাধারণ শারীরিক ব্যাধি হিসেবে বিবেচনা করত না। বরং, তাঁদের লোকমনস্তত্ত্বে এটি কোনো অপদেবতার আক্রমণ, অসন্তুষ্ট লোকদেবতার ক্রোধ কিংবা শনির কুদৃষ্টির অশুভ ফল হিসেবেই দেখা হত। তৎকালীন ব্রিটিশ সিভিল সার্জন এবং নৃবিজ্ঞানীদের নথিপত্রে যে সমাজ-মানসিকতার চিত্র পরিলক্ষিত হয়, তার একটি স্পষ্ট প্রতিফলন মেলে কোচবিহারের ডিস্ট্রিক্ট গ্যাজেটিয়ারে। সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, ডুয়ার্স এবং উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও মেচ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ম্যালেরিয়ার তীব্র কাঁপুনিকে কোনো সাধারণ শারীরিক ব্যাধি হিসেবে গণ্য করতেন না; বরং বহুক্ষেত্রে একে ক্ষতিকর অপদেবতার 'আছর' বা অতিলৌকিক প্রভাব বলে মনে করত। প্রান্তিক জনজাতির মানুষেরা প্রথাগত ওঝাদের চিকিৎসার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিলেন। "MALARIA AWARENESS AND PREVENTION PRACTICES AMONG TRIBAL INDIVIDUALS IN SOUTHERN ODISHA, INDIA: A CROSS-SECTIONAL STUDY".

ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সমগ্র উত্তর ভারতের জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব একটি অন্যতম ভয়াবহ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হলেও ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণে এই ম্যালেরিয়াজনিত মহামারীতে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছিল, যেখানে ডুয়ার্সের অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান, তরাই অঞ্চলের স্যাঁতসেঁতে জলবায়ু এবং ঘন বনাঞ্চল মশার বংশবৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করায় তৎকালীন চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনবসতিতে এই রোগ দ্রুত স্থানীয় মহামারীর রূপ ধারণ করে। এই ম্যালেরিয়া সংকটের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও প্রান্তিক শিকার ছিলেন ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা-বাগানে কর্মরত দরিদ্র আদিবাসী ও নারী শ্রমিকরা, যাঁদের চরম পুষ্টিহীনতা এবং গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়ার তীব্র আক্রমণের কারণে তৎকালীন অন্যান্য জেলার সাধারণ জনসংখ্যার তুলনায় মৃত্যুর হার আশঙ্কাজনকভাবে এবং যথাযথভাবে বেশি ছিল। একই সাথে, এই মহামারীর তীব্রতা কেবল শ্রমিক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ডুয়ার্সের এই প্রতিকূল জলবায়ুতে কর্মরত উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মকর্তারা এবং ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক আধিকারিকরা, ব্যাপকভাবে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতেন এবং সমসাময়িক ব্রিটিশ মেডিকেল রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ডুয়ার্স অঞ্চলে কর্মরত ইউরোপীয় অফিসারদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, যা তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোকে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া বিষয়ক বিশেষ চিকিৎসাতাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিল।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের আদিবাসী ও প্রান্তিক জনজাতিগুলোর স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পর্যালোচনা করলে প্রথাগত জ্ঞান এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাসের এক জটিল মেলবন্ধন পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত জনজাতির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক বা লিখিত নথিপত্রের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঐতিহাসিক অনুপস্থিতির কারণে, তাঁদের সুদীর্ঘকালের চিকিৎসাতাত্ত্বিক ভেষজ জ্ঞান মূলত মৌখিক ঐতিহ্যের (Oral Tradition) মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এই জ্ঞানান্তরের প্রক্রিয়ায় জনমানসের গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাস এবং প্রবীণদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এক অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা সমসাময়িক নব্য ও আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও, তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী ভেষজ পদ্ধতিটিকে কীভাবে সময়ের সাথে সাথে আরও উন্নত ও কার্যকর করে তোলা যায়, সেই বিষয়ের ওপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতেন।[৫]

তবে এই ব্যবহারিক ভেষজ চর্চার সমান্তরালে, তৎকালীন আদিবাসী মনস্তত্ত্বে লোকগাথা ও সমাজ-অনুমোদিত বিশ্বাসের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুগভীর ও বদ্ধমূল। রোগব্যাধি সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে তাঁরা জীবাণুর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরিবর্তে বহিরাগত উপাদান এবং অতিপ্রাকৃতিক বা দৈব অভিশাপকে দায়ী করতেন; যা তাঁদের বিশ্বাস সাপেক্ষে ছিল সম্পূর্ণ মানবীয় বোধশক্তির অতীত। ফলস্বরূপ, তৎকালীন ঔপনিবেশিক চিকিৎসা কাঠামোর অংশ হিসেবে খ্রিস্টান মিশনারী এবং আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা (Midwives) যখন বৈজ্ঞানিক প্রসূতিবিদ্যা ও ম্যালেরিয়া নিরাময়ের লক্ষ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাসেবা প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, তখন বহুক্ষেত্রেই আদিবাসী সমাজ এই বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপের চেয়ে প্রথাগত অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ওপর এবং ভেষজ নির্ভরশীলতা বজায় রেখেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই বিশ্লেষণ কোনোভাবেই ঐতিহ্যবাহী ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক বা ভিত্তিহীন হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস নয়। বরং, ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসে আদিবাসী জনজাতির এই ভেষজ চিকিৎসা পদ্ধতির একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক কার্যকারিতা ছিল, যা সমসাময়িক উদ্ভিদবিদ্যা ও লোক-চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিকটি অনস্বীকার্য। তবে এই ভেষজ জ্ঞানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা হল এর প্রায়োগিক পরিসরের আপেক্ষিক সংকীর্ণতা; সুনির্দিষ্ট কোনো লিখিত পরিকাঠামো পরীক্ষাগারের অভাব থাকায় অনেকক্ষেত্রেই এই জ্ঞানের পরিধি ও রোগ নির্ণয়ের সক্ষমতা একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেখা যেত। ফলস্বরূপ, এই প্রথাগত চিকিৎসাতত্ত্বের ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, এর প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের পরিসরটি সীমিত হওয়ার কারণে তা মহামারীর মতো তীব্র সংকটে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি; যা একই সাথে এই লোকজ পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং তার কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার দ্বান্দ্বিক রূপটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ফুটিয়ে তোলে।

এক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার মতো মারাত্মক ও প্রাণঘাতী রোগের হাত থেকে রক্ষা পেতে এই অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন স্থানীয় দেব-দেবীর পূজা করতেন এবং অলৌকিক শক্তির ওপর ভরসা রাখতেন। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের চিকিৎসকরা এই রোগটিকে একটি মারাত্মক মহামারী হিসেবে চিহ্নিত করেন, যা এই অঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই বিষয়ের একটি চমৎকার প্রমাণ পাওয়া যায় সামরিক সার্জন ডেভিড ফিল্ড রেনির বিবরণী থেকে। তিনি ভুটান যুদ্ধে অংশ নেওয়ার সময় ডুয়ার্স অঞ্চলের ম্যালেরিয়াপ্রবণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের একটি বিশদ ও বাস্তব চিত্র তাঁর নথিতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ক্যাপ্টেন উইলকিন্সের বক্তব্য রাখেন, তাঁর মতে -

> “a rude altar amongst a clump of trees near it, on which a few days previously had seen several male Lepchas performing a sacrifice in the following manner. Fires were lit on the altar, which consisted of a few stones placed on a hillock. A kid (baby goat) was tethered near the altar and was quietly grazing. Some fatty substance was thrown on the fires, the fumes of which rose into the air. One of the men, apparently, a priest was muttering prayers over the fire, and scattering rice about – near the altar, another priest was sitting near a larger fire. The former having ceased throwing the rice about, took an egg broke it, and caught the yolk on a leaf. He then carefully examined it, and apparently endeavoured to decipher some meaning from its appearance. It was then handed to the priest at the other fire, who cooked it. The kid was now brought near the altar, and the priest seized it, cut its throat and then severed the head, sprinkling the blood over the altar. More prayers were now said, and the ceremony concluded by the liver of the kid being cooked in the larger altar in the same manner as the egg. No

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> women were present, and the Lepchas said that the object of the sacrifice was to propitiate; in consequence of sickness being prevalent in the village – most likely an outbreak of the fever similar to that at the time prevailing amongst the troops and civilians of the station and which it was probable was occasioning considerable alarm; owing to a bad form of fever having been common amongst them the previous year...”[৬]

এইক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় উঠে আসছে যেমন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসার উত্তরবঙ্গে ম্যালেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী মহামারী গ্রামীণ সমাজকে একতাবদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করেছিল। এই মারণব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে গ্রামবাসীরা মূলত লোকজ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করার ওপর নির্ভর করতেন। তবে অনেকসময় প্রথম দফার পূজা বা আচারে যদি আশানুরূপ রোগমুক্তি না হত, কিংবা দেবতারা তাঁদের আকুতিতে সাড়া দিচ্ছেন না বলে মনে হত, তখন তারা ভেঙে পড়তেন না। বরং এই চিকিৎসাগত সংকট দূর করতে তারা পুনরায় দ্বিতীয়বারের জন্য বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান করতেন। ওঝা বা লোকজ চিকিৎসকদের সহায়তায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বিকল্প মন্ত্র ও আচারের প্রয়োগ করে তারা ম্যালেরিয়া নিরাময়ের নতুন পথ খুঁজতেন। অলৌকিক বিশ্বাসের এই পরিবর্তনশীলতা প্রমাণ করে যে, মহামারীর চরম সংকটেও স্থানীয় জনজাতি নিষ্ক্রিয় না থেকে আধ্যাত্মিক বিকল্পের মাধ্যমে রোগমুক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেত। ক্ষেত্রেও বিভিন্ন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যবর্তী গ্রামের মন্ত্রচ্চারনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখযোগ্য।

“ধুমতোরে আকাশ, ধুমতোরে পাতাল
নাই ফার পুজার পোরকাস...”[৭]

উত্তর ভারতে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রথম মন্ত্রটি প্রয়োগ করে যদি যথাযথভাবে রোগ নিরাময় না হত, তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ব্যবহৃত বিকল্প মন্ত্রটি ছিল—

“তুলসী আসন তুলসী বসন
তুলসী সিংহাসন...”[৮]

> “The Great Lord, I have laid the basil leaf as your royal seat. Please come to the earth and receive the worship. Please accept my offerings and absorb the disease of the ailing person within yourself.”[৯]

এছাড়াও জোকা জখমি' (জোকা যোগিনী) নামক লোকদেবীর আরাধনা একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।[১০] শাস্ত্রীয় বা বৈদিক সনাতন ধর্মের রীতিনীতি বহির্ভূত এই লোকজ আচারের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল, এতে কোনোপ্রকার বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ বা পুরোহিততান্ত্রিক অনুশাসন পরিলক্ষিত হত না। লোকগাথা অনুযায়ী, এই দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস মূলত এক স্থানীয় রাজবংশী যুবতীর অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল, যা কালক্রমে রোগ উপশমকারী এক লৌকিক ধর্মাচারে রূপান্তরিত হয়। স্থানীয় হিন্দু জনমানসে এই শক্তিটি মূলত একটি ‘সুর’ বা লৌকিক অপদেবতা হিসেবে চিহ্নিত হলেও, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে স্থানীয় মুসলিম গ্রামবাসীরা একে ‘জাঠ’ নামে সম্বোধন করত। সমসাময়িক সমাজকাঠামোয় জোকা জখমিকে মূলত ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য তীব্র ছোঁয়াচে রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে গণ্য করা হত, যার কোপ থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে এবং দেবীর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দুধ, কলা ও দইয়ের মতো লৌকিক উপাচারের মাধ্যমে নৈবেদ্য নিবেদন করা হত, যা প্রথাগত চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমান্তরালে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছিল।

এক্ষেত্রে প্রান্তিক জনমানসে রোগব্যাধির কারণ এবং তার নিরাময় সংক্রান্ত ধারণাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, লোকজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের (Folk Medicine) জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোটি মূলত দুটি স্পষ্ট ভাগে বিভক্ত ছিল— একটি অতিপ্রাকৃতিক (Supernatural) এবং অপরটি প্রাকৃতিক (Natural)। এই বিভাজনের প্রথম স্তরে, অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতিক ধারণার ক্ষেত্রে, স্থানীয় জনজাতিগুলো দেব-দেবীর রোষ, অশুভ আত্মার ক্ষতিকর প্রভাব, জাদুটোনা এবং ডাইনিবিদ্যার (Witchcraft) মতো লৌকিক বিশ্বাসগুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করত। এর পাশাপাশি, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি বা প্রথাগত আইন লঙ্ঘনের আধ্যাত্মিক পরিণতি এবং অশুভ নজরকেও তারা রোগ বিস্তারের প্রধান কারণ বলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনে করত; যেখানে সামাজিক বিধি অমান্য করলে রোগের সংক্রমণের তীব্রতা বা মহামারী চরম আকার ধারণ করতে পারে।

দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে জলবায়ুর পরিবর্তন, জৈবিক সংক্রমণ, খাদ্যে বিষক্রিয়া, অনিয়ন্ত্রিত বা উশৃঙ্খল জীবনযাপন এবং আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও সমসাময়িক সমাজবাস্তবতায় এই প্রাকৃতিক বা জাগতিক কারণগুলোর উপযোগিতা আংশিকভাবে অনস্বীকার্য ছিল, তার সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক সমাজকাঠামোয় রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণের তুলনায় অতিপ্রাকৃতিক ও লৌকিক ধারণার প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক পরিলক্ষিত হত। এর মূল কারণ হল লোকজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো ছাড়াই কেবল সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত লোকগাথা এবং মৌখিক ঐতিহ্যের (Oral Tradition) মাধ্যমে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়ে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত জীবন্ত, গতিশীল ও সচলভাবে বহমান এবং যা সমগ্র জনমানসে গ্রহণযোগ্যতারই এক অকাট্য প্রমাণ।[১১]

ঐতিহাসিক ও সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার এই তুলনামূলক প্রেক্ষাপটে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রান্তিক জনমানসে ওঝাতান্ত্রিক সংস্কৃতির শিকড় কতটা গভীর ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরে প্রোথিত ছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসন গ্রামীণ ও আদিবাসী অঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার প্রসার ঘটাতে এবং ম্যালেরিয়া মতো মহামারী সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করতে বিভিন্ন সময় আর্থিক অনুদান বা ফান্ডের (Funding) ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও, স্থানীয় জনগোষ্ঠী তা ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করেছে। এই প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিরোধের মূল কারণ কেবল তাদের সনাতন ও পুরনো পন্থার প্রতি অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তার চেয়েও বড় কারণ ছিল প্রান্তিক সমাজের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামো। এই জনগোষ্ঠী স্বকীয়ভাবে পরিচালিত হত না, বরং ওঝা, ফকির বা লোকজ নিরাময়কারীদের একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র গ্রামীণ স্তরে আধুনিকীকরণের বাহ্যিক প্রয়াস চালালেও, প্রান্তিক সমাজকাঠামোর এই মূল চালিকাশক্তি বা গোড়ার কান্ডটিকে নির্মূল করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে, ওঝাতান্ত্রিক দর্শনের এই আধিপত্যশীল উপস্থিতির কারণে ঔপনিবেশিক সচেতনতা ও চিকিৎসা নীতিসমূহ কেবল উপরিস্তরেই সীমাবদ্ধ রয়ে যায় এবং প্রান্তিক জনমানসের মনস্তাত্ত্বিক গভীরে প্রবেশ করে মূল ব্যাধির স্থায়ী সমাধান ঘটাতে পারেনি।

ঊনবিংশ শতকের প্রথাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে তথা ১৯০০ সালের পরবর্তী সময়কালে উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক উল্লেখযোগ্য গুণগত রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, ১৯১০ এবং তার মাঝামাঝি সময় থেকে ঔপনিবেশিক সরকারি উদ্যোগে ম্যালেরিয়া দমনের প্রধান চিকিৎসাতাত্ত্বিক উপাদান কুইনাইন (Quinine) যা উওরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স মধ্যেবর্তী অঞ্চলে সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য এক সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক বণ্টন নীতি গ্রহণ করা হয়। এই রাষ্ট্রীয় বণ্টন প্রক্রিয়াকে মাঠপর্যায়ে সফল ও কার্যকর করতে খ্রিস্টান মিশনারীদের ওপর সরাসরি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।[১২] দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে যেখানে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাব্যবস্থা সরাসরি পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের অঞ্চলে অবস্থিত জেনানা মিশন এবং স্থানীয় ডিসপেনসারিগুলো এই জীবনদায়ী ওষুধ বিতরণের প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ প্রকোপে আক্রান্ত পর্দানশীন মহিলারা এবং চরম অর্থনৈতিক দৈন্যতার শিকার দরিদ্র নারীরা, যাঁরা লোকলজ্জা বা অর্থের অভাবে প্রাতিষ্ঠানিক হাসপাতালে যেতেন না, তাঁদের কাছে এই ডিসপেনসারিগুলো অত্যন্ত কম মূল্যে তরল কুইনাইন বিতরণের অন্যতম প্রধান ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। লৌকিক ও ওঝাতান্ত্রিক প্রতিরোধের সমান্তরালে, মিশনারীদের এই সুসংবদ্ধ ঔষধীয় নেটওয়ার্কটি উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক ও নারী সমাজে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রবেশ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল।

সারমর্মে বলা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক জনজাতির মনস্তত্ত্বকে একক ও কোনো একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে বিচার করা সমীচীন নয়; কারণ ওঝাতান্ত্রিক বা অতিপ্রাকৃতিক দর্শনের প্রতি আনুগত্য যেমন রাতারাতি তৈরি হয়নি, ঠিক তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ধ্যান-ধারণাকে আত্মীকরণ করতেও যেকোনো সমাজের মননে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিবর্তনমূলক সময়ের প্রয়োজন হয়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক সমাজে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই মনস্তাত্ত্বিক জাগরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতার সূত্রপাত প্রধানত ১৯০০ শতকের পরবর্তী সময়কাল থেকেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছিল, যার একটি অন্যতম প্রধান অনুঘটক ছিল মিশনারী ডিসপেনসারিগুলোর মাধ্যমে কুইনাইন বণ্টন নীতি। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি কেবল অতীতের একটি অধ্যায় নয়, বরং সমসাময়িক জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসেও এর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য; কারণ ম্যালেরিয়াসহ যেকোনো ব্যাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার আজও বহু প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও প্রান্তিক মনস্তত্ত্বে সক্রিয় রয়েছে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, তৎকালীন ঔপনিবেশিক সমাজে খ্রিস্টান মিশনারীরা যেভাবে প্রথাগত ধাত্রী বা 'দাই'দের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রসূতিবিদ্যা ও রোগ নিরাময়ের আওতায় এনেছিলেন, ঠিক একইভাবে বর্তমান সমাজেও প্রান্তিক স্তরে বিভিন্ন ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জনস্বাস্থ্য নীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অতএব, অতীতের মিশনারী উদ্যোগ এবং বর্তমানের স্বাস্থ্য সংস্কার— উভয়ক্ষেত্রেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কুসংস্কারের বলয় থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আওতায় আনার যে ধারাবাহিক ও কাঠামোগত প্রয়াস, তা এই সমগ্র গবেষণাপত্রের মূল সারসংক্ষেপ ও অন্তর্নিহিত দর্শন হিসেবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি এবং যা নিয়ে গবেষণা বর্তমানে হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যমান।

সমসাময়িক ঔপনিবেশিক নথিপত্রেও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়, যেখানে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের (W.W. Hunter) মতো গবেষক ও প্রশাসক নিশ্চিত করেছেন যে, তৎকালীন গ্রামীণ সমাজকাঠামোয় গ্রামপ্রধানদের (Village Heads) একটি বৃহৎ অংশই ছিলেন স্বঘোষিত ওঝা বা লোকজ নিরাময়কারী, যাঁরা ঝাড়ফুঁক ও ভূত তাড়ানোর (Exorcism) মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের দাবি করতেন। এই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যবেক্ষণের সাথে একমত পোষণ করে সি. সি. সান্যালও দেখিয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মনস্তত্ত্বে এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল যে— যাবতীয় রোগব্যাধি মূলত অশুভ আত্মার কুদৃষ্টির কারণেই ঘটে থাকে। ফলে, তাঁদের কাছে রোগ নিরাময়ের একমাত্র অপরিহার্য ও আবশ্যিক পন্থা ছিল অশুভ আত্মাকে বিতাড়নের এই ওঝাতান্ত্রিক ঝাড়ফুঁক পদ্ধতি। এই জাদুকরী-ধর্মীয় দর্শনের আধিপত্যের কারণেই ঔপনিবেশিক সরকার যখন ম্যালেরিয়ার মতো প্রাণঘাতী মহামারীর আধুনিক চিকিৎসা বিস্তারে এবং মিশনারীদের চিকিৎসা পন্থায় বিপুল পরিমাণ আর্থিক বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন রাষ্ট্রীয় সেই সমস্ত উদ্যোগ চূড়ান্ত ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। বিশেষত, যে সমস্ত নিম্নবর্ণের ও প্রান্তিক জনজাতিসমূহ চরম অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে অর্থের বিনিময়ে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল, তাঁদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মিশনারীরা বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিনামূল্যে চিকিৎসামূলক শিবিরের আয়োজন করা সত্ত্বেও স্থানীয় সাধারণ মানুষ তা গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানায়। ফলস্বরূপ, ওঝাতান্ত্রিক সমাজ-নিয়ন্ত্রকদের মনস্তাত্ত্বিক বলয় এবং ব্যাধির অতিপ্রাকৃতিক কারণ সংক্রান্ত লৌকিক বিশ্বাস ঔপনিবেশিক জনস্বাস্থ্য নীতির আধুনিকীকরণ ও মিশনারীদের চিকিৎসাতাত্ত্বিক পরোপকারিতাকে প্রান্তিক জনমানসে সম্পূর্ণ অকার্যকর করে তুলেছিল।

পরিশেষে বলা যায়, ঔপনিবেশিক উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক জনস্বাস্থ্য রূপান্তরের ইতিহাসকে কেবল মিশনারী বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের (Midwives) চিকিৎসা পদ্ধতির সাফল্য কিংবা ব্যর্থতার একক আঙ্গিক থেকে মূল্যায়ন করা সমীচীন হবে না। সমসাময়িক নথিপত্রে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের (W.W. Hunter) মতো ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক আধিকারিকদের পর্যবেক্ষণও রাজবংশীসহ বিভিন্ন প্রান্তিক জনজাতির ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে, যেখানে রোগের কারণ ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি সুগভীর অতিপ্রাকৃতিক ও জাদুকরী-ধর্মীয় (Magico-religious) দৃষ্টিভঙ্গি সক্রিয় ছিল। এই দ্বান্দ্বিক অবস্থানটি সমকালীন সমগ্র চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সাযুজ্য ও তার প্রকৃত কার্যকারিতা নিয়ে একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও বিভিন্ন মিশনারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য সংস্কারের লক্ষ্যে বহুক্ষেত্রে অনুদান বা ফান্ডের (Funding) ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও এবং স্থানীয়দের চিকিৎসাতাত্ত্বিক প্রশিক্ষণের প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও, সাধারণ জনমানসে তা আশানুরূপ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি। এই সামগ্রিক বিশ্লেষণের অন্তরালে যে মনস্তাত্ত্বিক সত্যটি উন্মোচিত হয় তা হল— তৎকালীন নিম্নবিত্ত ও প্রান্তিক সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে ওঝা, ফকির বা লোকজ নিরাময়কারীরা ক্ষমতার এক অদৃশ্য উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা কেবল রোগ নিরাময় করতেন না, বরং তাঁদের ওঝাতান্ত্রিক দর্শনের মাধ্যমে সমগ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক মনস্তত্ত্বকে তারা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র আধুনিকীকরণের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লক্ষ্যে যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক সহায়তার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিল, তা এই স্থানীয় সাংস্কৃতিক আধিপত্য (Cultural Hegemony) ও মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীরকে ভেদ করে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় কার্যকরভাবে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতকের প্রথাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে, বিংশ শতকের প্রথমার্ধে তথা ১৯০০ সালের পরবর্তী সময়কালে উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় এক উল্লেখযোগ্য গুণগত রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, ১৯১০ এবং তার মাঝামাঝি সময় থেকে ঔপনিবেশিক সরকারি উদ্যোগে ম্যালেরিয়া দমনের প্রধান চিকিৎসাতাত্ত্বিক উপাদান কুইনাইন (Quinine) যা উওরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স মধ্যেবর্তী অঞ্চলে সাধারণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য এক সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক বণ্টন নীতি গ্রহণ করা হয়। এই রাষ্ট্রীয় বণ্টন প্রক্রিয়াকে মাঠপর্যায়ে সফল ও কার্যকর করতে খ্রিস্টান মিশনারীদের ওপর সরাসরি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান এবং সামাজিক কুসংস্কারের কারণে যেখানে রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাব্যবস্থা সরাসরি পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল, সেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের অঞ্চলে অবস্থিত জেনানা মিশন এবং স্থানীয় ডিসপেনসারিগুলো এই জীবনদায়ী ওষুধ বিতরণের প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। ম্যালেরিয়ার ভয়াবহ প্রকোপে আক্রান্ত পর্দানশীন মহিলারা এবং চরম অর্থনৈতিক দৈন্যতার শিকার দরিদ্র নারীরা, যাঁরা লোকলজ্জা বা অর্থের অভাবে প্রাতিষ্ঠানিক হাসপাতালে যেতেন না, তাঁদের কাছে এই ডিসপেনসারিগুলো অত্যন্ত কম মূল্যে তরল কুইনাইন বিতরণের অন্যতম প্রধান ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। লৌকিক ও ওঝাতান্ত্রিক প্রতিরোধের সমান্তরালে, মিশনারীদের এই সুসংবদ্ধ ঔষধীয় নেটওয়ার্কটি উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক ও নারী সমাজে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রবেশ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল।

সারমর্মে বলা যায়, কোনো একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে সামগ্রিক জনজাতির মনস্তত্ত্বকে একক ও কোনো একটি নির্দিষ্ট ছাঁচে বিচার করা সমীচীন নয়; কারণ ওঝাতান্ত্রিক বা অতিপ্রাকৃতিক দর্শনের প্রতি আনুগত্য যেমন রাতারাতি তৈরি হয়নি, ঠিক তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক ধ্যান-ধারণাকে আত্মীকরণ করতেও যেকোনো সমাজের মননে একটি দীর্ঘস্থায়ী বিবর্তনমূলক সময়ের প্রয়োজন হয়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক সমাজে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি এই মনস্তাত্ত্বিক জাগরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতার সূত্রপাত প্রধানত ১৯০০ শতকের পরবর্তী সময়কাল থেকেই দৃশ্যমান হতে শুরু করেছিল, যার একটি অন্যতম প্রধান অনুঘটক ছিল মিশনারী ডিসপেনসারিগুলোর মাধ্যমে কুইনাইন বণ্টন নীতি। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি কেবল অতীতের একটি অধ্যায় নয়, বরং সমসাময়িক জনস্বাস্থ্যের ইতিহাসেও এর প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য; কারণ ম্যালেরিয়াসহ যেকোনো ব্যাধিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানাবিধ সামাজিক কুসংস্কার আজও বহু প্রত্যন্ত গ্রামীণ ও প্রান্তিক মনস্তত্ত্বে সক্রিয় রয়েছে। ইতিহাসের এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, তৎকালীন ঔপনিবেশিক সমাজে খ্রিস্টান মিশনারীরা যেভাবে প্রথাগত ধাত্রী বা 'দাই'দের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত প্রসূতিবিদ্যা ও রোগ নিরাময়ের আওতায় এনেছিলেন, ঠিক একইভাবে বর্তমান সমাজেও প্রান্তিক স্তরে বিভিন্ন ধাত্রী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জনস্বাস্থ্য নীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অতএব, অতীতের মিশনারী উদ্যোগ এবং বর্তমানের স্বাস্থ্য সংস্কার— উভয়ক্ষেত্রেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে কুসংস্কারের বলয় থেকে মুক্ত করে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার আওতায় আনার যে ধারাবাহিক ও কাঠামোগত প্রয়াস, তা এই সমগ্র গবেষণাপত্রের মূল সারসংক্ষেপ ও অন্তর্নিহিত দর্শন হিসেবে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, এবং যা নিয়ে গবেষণা বর্তমানে হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও বিদ্যমান।

Reference:

১. Sarkar, Monoranjan. "Malaria in Jalpaiguri: The History of an Epidemic Disease from 1869-1947." Karatoya: NBU Journal of History, vol. 9, 2021, pp. 56-62. Institutional Repository of University of North Bengal.

২. Bhattacharya, Nandini. "The Logic of Location: Malaria Research in Colonial India, Darjeeling and Duars, 1900–30." Medical History, vol. 55, no. 2, Apr. 2011, pp. 183–202. PubMed Central.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 72
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 640 - 650
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৩. Biswas, Supam. "The Plantation Enclave, the Colonial State and Healthcare: A Study of the Tea Industry of Jalpaiguri Duars (1902-1947)." Karatoya: NBU Journal of History, vol. 17, Mar. 2024, pp. 152–162.
৪. Choudhury, Sumita Roy. "Women and Health Care System in Darjeeling & Jalpaiguri during 19th And 20th Century." Karatoya: NBU Journal of History, vol. 16, Mar. 2023, pp. 184–194.
৫. Ahmed, Sahara. "Epidemics in Tribal Folklore: Sub-Himalayan Bengal in the Nineteenth and Twentieth Centuries." Pandemics and Literature: Regional and Global Perspectives, edited by Kamlesh Mohan and Saurav Kumar Rai, Routledge India, 2024,
৬. Jha, Aakanksha. "Female Medical Missionaries and Gendered Authority in Colonial North India." Journal of Asiatic Society for Social Science Research, vol. 8, no. 1, 30 June 2026, pp. 181–191.
৭. Owary, Rupnath, and Phukan Ch. Basumatary. "Changes in Bodo Society and Culture as Reflected in Selected Short Stories of Nilkamal Brahma." International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol. 7, no. 9, Sept. 2018, p. 32.
৮. Bhattacharya, Nandini. Contagion and Enclaves: Tropical Medicine in Colonial India. Liverpool University Press, 2012.
৯. Fry, A. B. First Report on Malaria in Bengal. Bengal Secretariat Book Depôt, 1912.
১০. Hunter, W. W. A Statistical Account of Bengal: Districts of Darjiling, Jalpaiguri, and Kuch Behar. Vol. 10, Trübner & Co., 1876.
১১. Symington, John. In a Bengal Jungle: Stories of Life on the Tea Gardens of Northern India. Thacker, Spink & Co., 1935.
১২. Government of Bengal. Report of the Duars Committee. Bengal Secretariat Book Depôt, 1910.
১৩. Sunder, D. H. E. Final Report on the Land Revenue Settlement of the Western Duars, Bengal. Bengal Secretariat Press, 1895.
১৪. Christophers, S. R., and C. A. Bentley. Malaria in the Duars: Being the Second Report of the Anti-Malaria Operations in the Duars. Government Central Printing Office, 1908.
১৫. Ross, Ronald. Report on Malaria in the Tea Gardens of the Dooars and Assam. Indian Tea Association, 1910.